কল্যাণী

জীবনানন্দ দাশ

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

এক

রায়চৌধুরী মশাই নানা রকম কথা ভাবছিলেন : প্রথমত, জমিদারিটা কোর্ট অব ওয়ার্ডসে দিলে কেমন হয়?

ভাবতে গিয়ে তিনি শিহরিত হয়ে উঠলেন। অবস্থাটা অত খারাপ হয়নি।

কোনো দিনও যেন না হয়—ও রকম অবস্থা!

কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কথা তিনি ভুলে যেতে চাইলেন।

হাতের চুরুটটা নিভে গিয়েছিল।

রায়চৌধুরী মশাই জ্বালিয়ে নিলেন।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শালিখবাড়ির নদীর পাশে তার দরদালানটা—রায়চৌধুরীদের তেতলা জমিদারবাড়ি; সেই ক্লাইভের আমলে তৈরি আধ-ইংরেজি আধ-মুসলমানি ধরনে একটা মস্ত বড়ো ধূসর পুরীর মতো; চারদিককার আকাশ, মাঠ, ধানের খেত, নদী, নদীর বাঁক, খাড়ি, মোহনা, চরগুলোকে উপভোগ করবার এমন একটা গভীর সহায়তা করছে—দৈত্যরাজের উঁচু কাঁধের মতো এই প্রগাঢ় বাড়িখানা।

তেতলার পশ্চিম দিকে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে চৌধুরী মশাই দেখছিলেন সব—উত্তর দিকে ন্যাওতার মাঠ—ধু ধু করে অনেক দূরে ভিলুন্দির জঙ্গলে গিয়ে মিশেছে। এই মাঠে কত কী যে ব্যাপার কতবার হয়ে গেল—নিজের চক্ষেও চৌধুরী কত কিছু দেখলেন!

তারপর এল শান্তি—মাঠটা স্কুল-কলেজের ছেলেদের ফুটবল গ্রাউন্ড হলো, কখনোবা মিটিং হয় এখানে, কংগ্রেসের ক্যাম্প বসে,

ডিস্ট্রিক্ট টিচারদের, মুসলমানদের, মাহিষ্য নমশূদ্রদের কনফারেন্স হয়; বেদিয়ারা আসে, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের আখড়া হয়ে ওঠে।

এই সমস্তই শান্তির (উন্নতি অবসরের) জিনিস। আগেকার অনেক গ্লানি পাপ কলঙ্কের ওপর এগুলো ঢের সান্ত্বনার মতো।

(মাঠটার প্রায় সমস্ত জায়গাই এখন উলুঘাসে ভরে আছে—আর কাশে। কিন্তু ফুটবল খেলা আরম্ভ হবার আগেই মাঠের দক্ষিণ দিকটা বেশ পরিষ্কার করে নেওয়া হবে।)

বর্ষার মুখে শালিখবাড়ির নদীটা পেটোয়া হয়ে উঠেছে।

ইলিশ মাছের জালে জালে নদীটা ভরে গেছে; পশ্চিম মুখে নদীর কোলঘেঁষা একটা সরু লাল রাস্তার দিকে তাকালেন চৌধুরী—বিশ-পঞ্চাশটা ইলিশের নৌকা জমা হয়ে গেছে ওখানে—আধঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত টাউনটার নাড়িনক্ষত্রে ইলিশের চালান শুরু হবে।

কুড়ি-পঁচিশটা স্টিমার তিন-চারটা বড়ো বড়ো জেটির কিনার ঘেঁষে নদীর (ঘাটের কাছাকাছি) ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে; দু-একটা কয়লাঘাটার দিকে ধীরে ধীরে যাচ্ছে; সব সময়ই এমনি অনেকগুলো স্টিমার এই ঘাটে মোতায়েন হয়ে থাকে; এখানকার এ স্টিমারস্টেশন এ অঞ্চলে খুব বড়ো।

কলকাতার এক্সপ্রেস স্টিমার ছাড়ল।

চৌধুরী মশাইয়ের চুরুট জ্বলতে জ্বলতে নিভে গিয়েছে আবার।

জ্বালালেন তিনি।

জমিদারবাড়ির তেতলার কাছের আকাশটা ঘেঁষে কাকগুলো ভিলুন্দির জঙ্গলের দিকে চলল পশ্চিমের গোলাপি পিঁয়াজি মেঘের ভেতর নলচের মতো কালো কালো ঠোঁট মুখ পাখা নিচে সবুজ নাকি নীল জঙ্গল ধানক্ষেত্রে রুপোর পৈছের মতো নদী—শকুনের মেটে পাখা চিলের সাদা পেট সোনালি ডানা—রাত গাঢ় হয়ে নামবার আগে এইগুলো রঙের খেলা—রসের খেলাও বটে।

কিন্তু দু-এক মুহূর্তের শুধু—

শঙ্খচিলটা অন্তর্হিত হলো।

খানিকক্ষণ পরে পৃথিবী একটু চিমসে জ্যোৎস্না জোনাকি আর লক্ষ্মীপেঁচার দেশে এসে হাজির হয়েছে। (মন্দ নয়!) নিভন্ত চুরুটটা আবার জ্বালানো গেল।

চৌধুরী ভাবছিলেন : বড়ো ছেলেটা বিলেত থেকে ফিরবে না আর তাহলে? আইসিএস পড়তে গিয়েছিল; কিন্তু আইসিএস পাস করবার মতো চোপা তো তার নয়; একটা টেকনিক্যাল কিছু শিখে এলে পারত; কিন্তু তা-ও তো এল না; এই আট বছরের ভেতর ফেরবার নামটি অব্দি করছে না; আগে খুলে লিখতটিখত; এখন হদ্দ লুকোচুরি করছে। তাকে আর টাকা পাঠাবেন তিনি?

গুণময়ীর জন্যই—না হলে দু-তিন বছর আগেই তিনি টাকা বন্ধ করে দিতেন।

ছেলেটা হয়তো বিলেতে বিয়ে করেছে; তার স্ত্রী ছেলেপুলের ফটোও নাকি কারো কারো কাছে পাঠায় সে—

না, টাকা আর তাকে পাঠাবেন না তিনি।

ছোটো ছেলেটা হয়েছে কলকাতার এক লজ্জা; এদ্দিনে বিএসসি হয়ে যেত। কিন্তু এখনো সেকেন্ড ইয়ারে রয়েছে; বাপের টাকায় সুখের পায়রার অনেক সুখই মেটাচ্ছে সে—কিন্তু গোলাপের তোড়া হাতে থিয়েটারের গ্রিনরুমে ঢুকে শালিখবাড়ির ছোটো কর্তা নাকি...ভাবতে ভাবতে চৌধুরী বেকুব হয়ে পড়লেন।

কিন্তু মেজ ছেলেটির কথা ভাবলে মন বিধাতার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে—সে এখানে ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে প্র্যাকটিস করছে—বছরখানেক ধরে। এরই ভেতর জমিয়ে নিয়েছে।

চৌধুরী বলেছিলেন : হাইকোর্টে যাবে?

একটু সবুর করো, বাবা।

একটু সবুর করে প্রসাদ হাইকোর্টে যাবে—হয়তো পিউনি জজ হবে।

চৌধুরীর মন পরিতৃপ্তিতে ভরে উঠল।

(তারপর তিনি) নিজের মেয়েটির কথা ভাবতে লাগলেন; কল্যাণী এবার চোখের অসুখের জন্য আইএ দিতে পারল না। তিনিই নিষেধ করেছেন দিতে! আর কেন? পড়বার শখ—তা সে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে ঢের হয়েছে—ঢের—এইবার মেয়েটার একটা কিছু স্থির করতে হবে।

দুই

চৌধুরী মশাই সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন না বটে, কিন্তু জীবনের প্রতি কাজে—প্রতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজেও পদে পদে বিধাতাকে মানেন তিনি। ভালো করলেও এ বিধাতাই করেছেন, অমঙ্গল করলেও এ বিধাতারই না জানি কী নিগূঢ় ইঙ্গিত—এমনে তার বিশ্বাস—অত্যন্ত স্পষ্ট—কেমন সরল—কী যে আন্তরিক—গভীর বিশ্বাস তার। (লোকটি) জানেন-শোনেন অনেক; উনিশ শ এক সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে চৌধুরী বিএ পাস করেছিলেন। সেই থেকে পড়াশোনার ঢের চর্চা নানা দিক দিয়ে করে এসেছেন। বাড়িতে মস্ত বড়ো একটা লাইব্রেরি আছে—আজও নতুন নতুন মোটাসোটা বই ঢের আসে কলকাতার দোকানপাট থেকে—বিলেতের ফার্মগুলোর থেকে অব্দি; নানা রকম দেশি বিলিতি নিবিড় ম্যাগাজিন আসে সব। এত চিন্তা যুক্তি গবেষণার আবহাওয়া মানুষের শ্রদ্ধা বিশ্বাসের তাল খসিয়ে উড়িয়ে ফেলে—কিন্তু তবু চৌধুরী আজও কোনো কথা কাজ বা

ব্যবহারের ধাপ্পাবাজি ভোজবাজি গোঁজামিলের ভেতরে নেই,—মানুষের মনের অতি উৎসুক চিন্তা ও প্রশ্ন যেন বারবধূদের মতো (নয় কি?)—সেসবের হাত থেকে তাঁর ধর্মকে রক্ষা করেন তিনি, ন্যায়কে রক্ষা করেন, নিজের বিধাতাকে রক্ষা করেন।

যেন কখনো কোনো ব্যভিচার না হয়—অবিচার না হয় যেন—মঙ্গলময় ভগবান জীবনের পদে পদে প্রতিফলিত হয়ে চলেন যেন—চৌধুরী মশাই খুব খাঁটি আগ্রহে নিজের মনকে অনেক সময়ই এই সব কথা বলেন।

কল্যাণী কলকাতার থেকে এসেছে; ছোটো ছেলে কিশোরও এসেছে। একদিন বিকেলবেলা প্রসাদ কোর্টের থেকে ফিরে বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে চুরুট টানছিল।

বাবা এসে আরেকটা ইজিচেয়ারে বসলেন।

প্রসাদ চুরুটটা ফেলে দিতে যাচ্ছিল।

চৌধুরী বললেন—তা খাও; আমিও তো খাই। লাঙস আমাদের দুজনেরই ভালো আছে।

হাসলেন।

নিজেও চুরুট বের করলেন।

প্রসাদও টানতে লাগল।

চৌধুরী বললেন—এবার কাজের কথা।

প্রসাদ বাবার দিকে তাকাল—

'তোমার দাদাকে আর টাকা পাঠাব না ঠিক করেছি।'

প্রসাদ চুপ করে রইল; সে তো বরাবরই বাবাকে বলে এসেছে দাদাকে টাকা পাঠান মানে জমিদারি আস্তে আস্তে গুটিয়ে ফেলা; প্রজারা খাজনা দিতে চায় না, গভর্নমেন্টকে রেভিনিউ দিতে হচ্ছে, সম্পত্তি ভেঙে খেতে হচ্ছে—ওকালতি করতে বাধ্য হতে হচ্ছে—অনেক কিছুই দাদার গুখখুরির জন্য।

পঙ্কজবাবু বললেন—অন্যায় হবে, প্রসাদ?

প্রসাদ বললে—একেবারেই ওকে একটা পয়সাও আর কোনো দিন তুলে দেবে না, এইটে আগে ঠিক করতে পারো যদি—(তারপর কথা।)

পঙ্কজবাবু একটু স্থির থেকে বললেন—কী করে আর দেই?

প্রসাদ বললে—স্টেটে টাকা নেই বলে?

—না, তা নয়।

—তবে কী, বাবা?

—টাকা এখনো—টাকা বিজলীকে পাঠাবার ক্ষমতা এখনো দু-চার বছর বেশ আছে আমার—কিন্তু—

পঙ্কজবাবু থামলেন—

প্রসাদ বললে—তাহলে দু-চার বছর আরো পাঠাও—

—তা পাঠাব না।

প্রসাদ একটু হেসে বললে—ওর চিঠি পেলে তোমার মন খুব উসখুস করে না বাবা কোনো কল্পিত সংকল্পই টেকে না আর তোমার। দাদা খুব চমৎকার চিঠি লিখতে পারে।

—ওর চিঠি এবার আর পড়বও না আমি—কেবল পাঠালে ছিঁড়ে ফেলে দেব। প্রসাদ ঘাড় হেঁট করে চুরুটটার দিকে তাকাচ্ছিল।

পঙ্কজবাবু বললেন—এই-ই ঠিক হবে।

তাঁকে খুব দূর মনে হলো।

প্রসাদকে বললেন—তোমার মাকে বলিনি।

—কী দরকার বলবার?

—দরকার নেই, কী বলো?

—মিছেমিছি কেন আর?

—অন্যায় হবে না?

—কিসে বাবা?

—এই যে তোমার মার কাছে গোপন করলাম—অন্য কাউকে বলিনি—অন্যায় Not sending money—অন্যায়?

প্রসাদ চুরুটের মুখের থেকে ছাই ঝেড়ে ফেলে কিছুক্ষণ ক্লান্ত হয়ে বসে রইল। পরে বললে—আমাদের খেতে হবে তো?

—তাই তো।

—কিশোরকে দেখতে হবে, কল্যাণীর কথা ভাববার রয়েছে—

পঙ্কজবাবু বললেন—না, না, অন্যায় হবে না কিছু। কত ছেলে মরে যায় মা-রা সহ্য করে না?

বললেন—আমি তো মনে করি বিজলী মরে গেছে—তোমার মাও সে রকম ভাবতে পারবেন না?

প্রসাদ বললে—না যদি পারেন তিনিও মরে যাবেন—

পঙ্কজবাবু বিস্মিত হয়ে প্রসাদের দিকে তাকালেন।

প্রসাদ বললে—কিন্তু তিনি মরবেন না। কে কার জন্য মরে?

দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ করে রইল—

প্রসাদ বললে—কিন্তু মা যেন এসবের একটুও আঁচ না পায়,—তাহলে খুঁচিয়ে শেষ পর্যন্ত তোমাকে দিয়ে টাকা পাঠিয়ে ছাড়বে—

পঙ্কজবাবু বললেন—তা বটে—

প্রসাদ বললে—ঘোঁট আর কোরো না কিছু—টাকাটা বন্ধ করে দিয়ে—

গুণময়ী একমুহূর্তের জন্য এসে দাঁড়ালেন—শাড়িতে হলুদ লঙ্কার চ্যাপসা, হাত পা গায়ে মসলার গন্ধ, মাছের মিষ্টি আঁশটে গন্ধ...একেবারে রান্নাঘরের থেকে ছুটে এসেছেন—

প্রসাদের দিকে তাকিয়ে গুণময়ী বললেন—একেবারে তিনটে রুই মাছ ভেট পাঠিয়েছে।

—কারা, মা!

ঘোষালরা।

স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—একেকটা রুই যেন একেকটা সোমত্থ মানুষের বাচ্চা—এমন তরতাজা মাছ—আহা, কাটতেও কষ্ট হয়—

পঙ্কজবাবু বললেন—তাহলে কাটো কেন?

—আহা, একদিন ভালো করে মাছের কালিয়া হলো না। যাই—আমি না রাঁধলে আবার ওই বামুনের রান্না খেতে পারবি, প্রসাদ?

প্রসাদ মাথা নেড়ে বললে—তা পারব না আমি।

গুণময়ী বললেন—আহা, বিজলীও পারত না—

প্রসাদ ফু ফু করে হেসে বললে—আজ খ্রিষ্টানের রান্না খাচ্ছে—

গুণময়ী হতাশ হয়ে বললেন—সে কী রকম রান্না রে?

—সে কী রান্না! সব সেদ্ধ—শালগম সেদ্ধ—মুলো সেদ্ধ—বিট সেদ্ধ—স্যালাড—আধসেদ্ধ মাছ—আঁশটে।

গুণময়ী একটা খোঁচা খেয়ে অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

পঙ্কজবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন—

পরে বললেন—মেম বিয়ে করেছে, দেশে আসতে চায় না, মা বাবা ভাই বোন কারোর কাছে একখানা চিঠি অব্দি না—আমার কাছে শুধু সেই টাকাকড়ির চিঠিগুলো ছাড়া—এ কেমন?

প্রসাদ বললে—কেমন অস্বাভাবিক যেন।

—আমাদের এস্টেট তো খুব বড়ো নয়—নানা দিক দিয়েই জড়িয়ে গেছে—তার ওপর নবাবের হালে এই আট বছর ওকে টাকা পাঠালাম—ও যা পেত, তার চেয়ে ঢের বেশি ওকে দেওয়া হয়ে গেছে—

পঙ্কজবাবু থামলেন—

তারপর বললেন—কাজেই দ্বিধার কিছু নেই—যদি আমি—

প্রসাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—না, প্রসাদ?

কিন্তু মন যেন পঙ্কজবাবুর সায় পাচ্ছে না—কোথায় যেন কেমন কী খোঁচ থেকে যায়—

মনের এই সংকোচ বাধাকে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে বললেন—টাকা পাঠালেই-বা হবে কী—কোনো ভালো কাজে তো নয়—থিয়েটার রেসে ওড়াবে। তা ছাড়া নিজে সে ঢের বড়ো হয়েছে এখন; নিজের ঘাড়ের দায়িত্ব এখন ভালো করে বোঝা উচিত তার। নিজের রোজগার করা উচিত তার। না করতে পারে—আসুক এখানে—আমরা দেখব সব। নাহলে এক পয়সাও পাঠাব না।

(পরদিন পঙ্কজবাবু প্রসাদকে বললেন—সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিজলীকে আর একখানা চিঠি লিখলাম এই। না যদি শোনে, আর টাকা পাঠাব না। এবার দেড় হাজার পাঠালাম—আধাআধি কমিয়ে দিয়েছি—

কিন্তু কয়েক দিন পরে আরো দেড় হাজার পাঠিয়ে দিলেন তিনি।)

পরদিন সকালবেলা প্রসাদ ছাড়া আর সকলেই ছিল তেতলার পুব দিকের বারান্দায়।

কল্যাণী বললে—বাবা, ন্যাওতার মাঠ কেন বলে? ন্যাওতা মানে কী?

—কী জানি।

কিশোর বললে—শব্দটা কি আরবি না ফারসি না ইংরেজি—

পঙ্কজবাবু বললেন—জানি না

কল্যাণী বললে—কোনো ডিকশনারিতে এর মানে পাবে না, ছোড়দা—

—তবে ন্যাওতার মাঠের মানে কী?

—সত্যি, ন্যাওতার মাঠ ওটাকে বলে কেন!

—কী অদ্ভুত শব্দ!

—কোনো মানে নেই—কী বিশ্রী!

পঙ্কজবাবু অবিশ্যি মানেটা জানতেন—(অন্তত) যে প্রবাদ অনেক দিন থেকে এ মাঠের সম্পর্কে এ অঞ্চলে প্রচলিত হয়ে এসেছে, তার সমস্তটুকুই জানতেন তিনি। কিন্তু সেসব কাহিনি বলতে গেলে পূর্বপুরুষদের দু-একটা গ্লানি বেরিয়ে পড়ে—কাজেই বললেন না কিছু।

কল্যাণী বললে—ভিলুন্দির জঙ্গলই-বা কী?

—তাই তো—

—আমি অনেক দিন ভেবেছি—কোনো মানে বের করতে পারিনি—

—আমিও না।

কিশোর বললে—ভিলুন্দি বলে আবার একটা শব্দ আছে নাকি কোথাও?

কল্যাণী বললে—ছাই আছে।

একটু পরে : কোনো ডিকশনারিতে পাবে না তুমি, ছোড়দা।

কল্যাণী বললে—কত সুন্দর সুন্দর নাম দিতে পারত না, ছোড়দা? তা না ভিলুন্দির জঙ্গল—

পঙ্কজবাবু বললেন—আচ্ছা বেশ।

বললেন—ও নাম আমার কাছে ঢের সুন্দর শোনায়।

এই জঙ্গলের সম্পর্কেও অনেক দিন থেকে একটা কাহিনি চলে আসছে; কিন্তু নানা কারণে সেই গল্পটাও এদের কাছে আজ তিনি পাড়তে পারলেন না।

কল্যাণী বললে—মোটের ওপর এ জায়গাটা আমার ভালো লাগে না—

পঙ্কজবাবুর হাত থেকে খবরের কাগজ আস্তে আস্তে তাঁর কোলের ওপর পড়ে গেল—

কল্যাণীর দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে তিনি বললেন—ভালো লাগে না নাকি? এ জায়গাটা তোমার ভালো লাগে না, কল্যাণী?

—না!—

—কেন?

কল্যাণী বললে—বড্ড পাড়াগাঁর মতো—

কিশোর বললে—হ্যাঁ, একটা ডিস্ট্রিক্ট টাউন—জজ ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের হেড কোয়ার্টার ওমনি পাড়াগাঁ বলে দিলেই হলো আরকি!

কল্যাণী বললে—তা হোক গে—

গুণময়ী বললেন—তা ছাড়া মেয়ে আমার এই কলকাতা থেকে নেমেছে, আহা, একটু একলাটি লাগবেই তো!

পঙ্কজবাবু বললেন—আমাদের এ দিকটা আবার একেবারে শহরের এক প্রান্তে কিনা—

কল্যাণী বললে—কি কেবল দিনরাত ঘুঘু ডাকে—আমার ভালো লাগে না—কিশোর হেসে উঠল—

বললে—সেই হরিণ মারার রাইফেলটা নিয়ে একবার বেরোতে হবে—জানো মা, আমি লিলুয়াতে গিয়ে প্রায়ই পাখি মারি—ঘুঘু, লালশিরে, স্নাইপ, বুনো মুরগি, বালি হাঁস—হাত বেশ পেকে গেছে এখন—

কিশোরের কথায় কেউ কান দিচ্ছিল না—

গুণময়ী বললেন—তুমি কেন দিনরাত ঘুঘুর ডাক শুনতে যাও, কল্যাণী?

—বা মার যেমন কথা, ঘুঘু ডাকবে, আমি শুনব না?

কিশোর বললে—তুমি বুঝি শোনো না, মা?

পঙ্কজবাবু বললেন—কই, আমার তো ঘুঘুর ডাক খারাপ লাগে না।

গুণময়ী বললেন—আমারও না।

কিশোর বললে—তা তোমরা গেঁয়ো বলে।

পঙ্কজবাবু বললেন—বাস্তবিক।

কল্যাণী বললে—এমন টেনে টেনে ডাকে; সারা দিন—সারা দুপুর—শুনতে শুনতে আমার কিচ্ছু ভালো লাগে না আর—তার ওপর ক্যারাম বোর্ড নেই; তাস খেলব কাদের নিয়ে—কেউ নেই—সে রকম কোনো লোকজন নেই, একটু সিনেমা দেখতে পারা যায় না, থিয়েটার নেই, গান নেই—সব সময়ই ঘরদোর এমন থমথম করছে।

কিশোর হো হো করে হেসে উঠল—

পঙ্কজবাবু বললেন—তুমি তাহলে ক্যারাম খেলতেও শিখেছ—?

কল্যাণী বললে—কবে শিখেছি!

—বোর্ডিংয়ে গিয়ে?

—বা, এখানেই তো—

—এখানে?

—বা, ছোড়দার একটা বোর্ড ছিল—

পঙ্কজবাবু বললেন—ও—

বললেন—বিলিয়ার্ডস খেলতে জানো, কল্যাণী?

—না।

—কলকাতায় খুব বায়োস্কোপ দেখতে?

—হ্যাঁ।

—কার সঙ্গে যেতে?

—কল্যাণী একটু ফাঁপরে পড়ল—

বললে—মেয়েদের সঙ্গেই যেতাম।

—তা যেতে দেয়—